STOP
ATROCITIES
ON
MINORITIES

পরিষদ বার্তা

জানুয়ারি ২০১৬
নবপর্যায় ৩৩
মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ’র মুখপত্র

ওলামা লীগের সঙ্গে উগ্র ধর্মান্ধ দলের পার্থক্য কোথায়?

অজয় দাশগুপ্ত

বিজয়ের মাস ডিসেম্বরেই বাংলাদেশের সব হিন্দু সংগঠন নিষিদ্ধের দাবি করেছিল আওয়ামী ওলামা লীগ নামের একটি সংগঠন। তাদের আরও দাবি–প্রচলিত শিক্ষা নীতি বাতিল করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক থেকে সব হিন্দু লেখকদের লেখা বাদ দিতে হবে। হিন্দুদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি চাকরিতে তাদের ন্যূনতম অধিকার দেওয়া চলবে না। এ সব দাবিতে প্রকাশ্যে সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছে মাওলানা মোহাম্মদ আখতার হোসেন বোখারির নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী ওলামা লীগ নামের সংগঠনটি। বাংলাদেশের বর্তমান মহাজোট সরকার সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাসহ রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি ফিরিয়ে আনার জন্য কৃতিত্বের দাবিদার। জিয়াউর রহমান এবং এইচ এম এরশাদের নিষ্ঠুর সামরিক শাসনামলে সংবিধান বার বার সংশোধন করে দেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার পথ খুলে দেওয়া হয়। জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলামীর মতো সংগঠন বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মতো মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তির শাসনামলেই ডালপালা বিস্তার করতে পারে। তারা ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের দাবি তুলছে। আওয়ামী ওলামা লীগের সঙ্গে ওই সব উগ্র ধর্মান্ধ দলের পার্থক্য কোথায়?

অসাম্প্রদায়িক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের পরিচিতি ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে। পাকিস্তানে শাসকরা এ দলকে কোনঠাসা করার জন্য ভারতের দালাল, হিন্দুদের দালাল বলেছে। বেগম খালেদা জিয়া তার নির্বাচনী প্রচারের সময় বলেছেন, আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে সব মসজিদে উলু ধ্বনি শোনা যাবে এবং আযান বন্ধ হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন বলে দাবিদার ওলামা লীগের বক্তব্যের সঙ্গে উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কোনো পার্থক্য আছে কি? এ সংগঠনটি বলছে, বামপন্থি ও হিন্দু ব্যক্তিদের দিয়ে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই এ শিক্ষা নীতি গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের আরও দাবি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে বহিস্কার করা। দুঃখজনক যে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এ ধরনের সংগঠন কীভাবে তাদের নাম ব্যবহার করে, সেটা নিয়ে মুখ খোলেনি। আমরা ধরে নিতে পারি যে জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলামীর মতো শক্তি আওয়ামী ওলামা লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচারণায় খুশি হচ্ছে। তারা নিজেরা যে বক্তব্য দিতে চায়, সেটা আওয়ামী লীগের নামেই কেউ দিচ্ছে। কিন্তু দেশের জন্য কি এ ধরনের অবস্থান মঙ্গল বয়ে আনবে? প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এ সংগঠনকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। তারপরও কীভাবে তারা বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগের নাম ব্যবহার করতে পারছে, সেটা আমরা বুঝতে অক্ষম।

পৃষ্ঠা ২

সারাদেশে প্রতিবাদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা লীগ নামের একটি সংগঠন সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চালানোর এক পর্যায়ে অতি সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বানে গত ১৪ জানুয়ারি সারাদেশে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত প্রতিবাদী সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও নিজ নিজ জেলার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি পালিত হয়। স্মারকলিপিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিম্নোক্ত বক্তব্য অভিন্নভাবে তুলে ধরা হয় :

জননেত্রী শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও
সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
(জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে আপনি আমাদের আন্তরিক

পৃষ্ঠা ৩

মিথ্যা কুরুচিপূর্ণ অপপ্রচার চালিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে হটানো যাবে না: ঐক্য পরিষদ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বলেছে, কোন প্রকার মিথ্যা, কুরুচিপূর্ণ, ভিত্তিহীন, অপপ্রচার চালিয়ে আপামর ধর্মীয়-জাতিগত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের সম অধিকার ও সম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে কিছুতেই বিচ্যুত করা অতীতেও যায় নি, ভবিষ্যতেও যাবে না। অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল প্রকার ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলনও এগিয়ে যাবে।

গত ৪ জানুয়ারি সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এ কথা বলা হয়। লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। এ সময় কাজল দেবনাথ, মিলন কান্তি দত্ত, নির্মল চ্যাটার্জীসহ ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে আওয়ামী ওলামা লীগের সাম্প্রতিক বক্তব্যে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলা হয়, আওয়ামী ওলামা লীগ নামধারী এ সংগঠন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে ‘ইসলামী বাংলাদেশ’ পরিচয়ে সংবিধানবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ড পরিচালনা করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। সরকারি দলের নাম ভাঙ্গিয়ে যে সরকারবিরোধী, দেশবিরোধী, ধর্মবিরোধী অপতৎপরতা আওয়ামী ওলামা লীগের নামে চালানো হচ্ছে তাতে শান্তিপ্রিয় জনমনে ইতিমধ্যেই নানান প্রশ্ন ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে, জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। নিম্নে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ দেয়া হলো :

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ

পৃষ্ঠা ৩

ধামরাইয়ে ঐতিহ্যবাহী যশোমাধব মেলাভূমির সম্পত্তি গ্রাসের চক্রান্ত রুখতে হাজার হাজার মানুষের মানববন্ধন

॥ ধামরাই থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ॥

ঢাকার ধামরাইয়ে ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রীযশোমাধব মেলাভূমির সম্পত্তি মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রতিবাদে ৩১ জানুয়ারি মেলাভূমিতে মানববন্ধন করেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার মানুষ। শ্রীশ্রীযশোমাধব মন্দির পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহণ করে। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ যশোমাধবের দেবোত্তর ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার এই পদক্ষেপকে গোটা সম্পত্তি গ্রাস করার চক্রান্ত বলে বর্ণনা করেন।

ধামরাই পৌরসভার যাত্রাবাড়ী এলাকায় যশোমাধবের দ্বিতীয় মন্দির প্রাঙ্গণ যশোমাধব মেলাভূমিতে এ মানববন্ধন করা হয়। এতে বাংলাদেশ ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রীযশোমাধব মন্দির পরিচালনা কমিটি, ইসলামপুর সর্বজনীন দুর্গামন্দির, শ্রীশ্রীশিব-কালীমন্দির, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, যুবজোট, ছাত্র মহাজোট, শ্রীশ্রীমহাদেব মন্দির, শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই পঞ্চায়েত মন্দির, বড় বাজার দুর্গামন্দির, শ্রীশ্রীশনিদেব মন্দির, ধামরাই উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদ, শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রক্ষ্মচারী আশ্রম, দক্ষিণপাড়া কালীমন্দির, পালপাড়া শ্রীশ্রীকালীমন্দির, পূর্ব কায়েতপাড়া দুর্গা ও কালীমন্দির এবং পশ্চিম কায়েতপাড়া কালীমন্দিরের কর্মকর্তা, সদস্য ও ভক্তরা অংশ নেন।

> একটি দুষ্ট চক্র ও সরকারের কতিপয় কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে

বাংলাদেশ পূজা উদ্যাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথ বলেন, ধামরাইয়ের শ্রীশ্রীযশোমাধব মন্দির ও রথমেলা সব ধর্মের মানুষের। আর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানও অনস্বীকার্য। কিন্তু একটি দুষ্ট চক্র ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তা এ দুই পক্ষকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এটা কখনো মেনে নেওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীযশোমাধব মন্দির পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজীব প্রসাদ সাহা বলেন, ধামরাইয়ের যশোমাধব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ৪০০ বছর আগে। ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই মন্দিরকে ঘিরে রথযাত্রা উৎসব ও মেলা চলছে। ধামরাই মৌজার যাত্রাবাড়ী এলাকায় মাধবের দ্বিতীয় মন্দির প্রাঙ্গণে যশোমাধবের নামে ১৬৭ শতাংশ জমি রয়েছে। কোনো দলিল ছাড়াই এসএ ও আরএস রেকর্ডে ওই সম্পত্তি খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ধামরাইয়ের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শামীম রহমান বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ঢাকার জেলা প্রশাসক গত বছরের ডিসেম্বর মাসে ধামরাই মৌজা থেকে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে ৮ শতাংশ অকৃষিজমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দিয়েছেন। মন্দির পরিচালনা কমিটি এটা

পৃষ্ঠা ২

ধামরাই'র ঐতিহ্য
ভূমি দখল করা
শ্রীশ্রীযশোমাধব মন্দির

ঢাকার ধামরাইয়ে শ্রীশ্রীযশোমাধব মেলাভূমির সম্পত্তি বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রতিবাদে হাজার হাজার সংখ্যালঘু মানুষের মানববন্ধন। এই পদক্ষেপকে দেবোত্তর ভূমি গ্রাসের চক্রান্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।
ছবি : পরিষদ বার্তা

১৪ জানুয়ারি পটুয়াখালিতে ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি পেশ। ছবি : পরিষদ বার্তা

যশোমাধব মেলাভূমির সম্পত্তি গ্রাসের চক্রান্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মন্দিরের জমি হিসেবে দাবি করলেও ওই জমি সরকারের খাস খতিয়ানভুক্ত।

মানববন্ধনে মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি জীবন কানাই দাস বলেন, সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানার পর মন্দির পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে আদালতে মামলা করা হয়েছে। মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই যশোমাধব মেলাভূমিকে অকৃষি খাসজমি দেখিয়ে সেখান থেকে ৮ শতাংশ জমি মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এক মাসের মধ্যে বন্দোবস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে মন্দিরের জমি ফিরিয়ে দেওয়া না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জি, বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদের সভানেত্রী জয়ন্তী রায়, বাংলাদেশ ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদের সহসভাপতি দীপালি চক্রবর্ত্তী, ঢাকা জেলা পূজা উদ্যাপন পরিষদের সদস্যসচিব আশীষ কুমার মজুমদার, যশোমাধব মন্দির পরিচালনা কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অসিত কুমার গোস্বামী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সুমনা গুপ্তা প্রমুখ।

ওলামা লীগের সঙ্গে উগ্র ধর্মান্ধ দলের পার্থক্য কোথায়?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তানের শাসকরা যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করেছিল তারই পরিণতি ছিল ১৯৭১ সালে গণহত্যা। তারা সব কিছুর মধ্যে দেখেছিল ভারতের কালো হাত, হিন্দুদের কালো হাত। মুক্তিযুদ্ধে তারা আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী-সমর্থকদের পাইকারিভাবে হত্যা করেছিল, হিন্দুদের পাইকারিভাবে হত্যা করেছিল। এই জালিমশাহীর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই রুখে দাঁড়িয়েছিল। যে ভারতকে পাকিস্তানিরা শত্রু গণ্য করতে বলেছিল, তারাই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এখন ওলামা লীগ যা বলছে তার সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এবং তাদের দোসর জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান অভিন্ন। মহাজোট সরকার সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনের কার্যক্রমকে পছন্দ করে না, এমন বক্তব্য আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে বলেছেন। কিন্তু আওয়ামী ওলামা লীগ নামের যে সংগঠনটি নিয়মিত যে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে চলেছে, সে ব্যাপারে কেন তারা নিরব?

গোটা বিশ্ব এখন ইসলামী স্টেট নামে হিংস্র গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডে উদ্বিগ্ন।

সিরিয়াকে কেন্দ্র করে তারা তৎপর। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে এই অপশক্তি দারুণভাবে সক্রিয়। বাংলাদেশে তারা কর্মকাণ্ড শুরু করতে চাইছে– এমন খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে আনছে। আওয়ামী ওলামা লীগ কি তাদের হয়ে কাজ শুরু করেছে? তারা কি আইএস-এর চর?

আমার আমি

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

ভূমিকা, শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-নারী- পেশাজীবীদের সংগ্রামে আপোষহীন ভূমিকা পালন, লাখো লাখো নেতা-কর্মীর দুঃখকষ্ট-কারাভোগ- পলাতক জীবনযাপন- বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ ও রোগভোগ- মুক্তিযুদ্ধে আত্মদান ও ত্যাগ তিতিক্ষা নজীরহীন সাহসিকতার যোগফলে ইতিহাস নির্মাতার অন্যতম ভূমিকা পালনকারী ন্যাপ- সিপিবির বিশাল অবদানের পাশাপশি উপরোক্ত ঐতিহাসিক ভুল- নেতৃত্বের অপরাধ বলে গণ্য হবে চিরদিন।

১১ দফা ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐক্যের ভিত্তি। ৬ দফাকে অবিকল রেখে তার সাথে শিক্ষার দাবি, বৃহৎ শিল্প কারখানা জাতীয়করণ, বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান, কৃষক- শ্রমিক জনগণের বাঁচার দাবি প্রণীত হয়। এটাকে ৬ দফা ও ১১ দফার সংমিশ্রণ বিবাহবন্ধন বলা চলে। প্রায় দু'বছর ব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে এই অসাধ্য সাধন সফল হয়। ছাত্র লীগ ৬ দফাকে মুক্তি সনদ মানতো, এর কমে নয় বা বেশীতে তারা যাবে না, মেনন গ্রুপ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মসূচী ছাড়া ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করবে না- ৬ দফার ভিত্তিতে তো নয়ই। ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) পক্ষ থেকে দুটি পরস্পর বিরোধী চিন্তাকে সমন্বিত করে দীর্ঘ আলোচনা শেষে ঐতিহাসিক ১১ দফা প্রণীত হয়। এজন্য ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) পক্ষ থেকে দুটি কনসেশন দিতে হয়। (১) জগন্নাথ কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীকে কারচুপি করে পরাজিত করার কারণে রীট করে উক্ত নির্বাচন স্থগিত করা হয়।

ছাত্র লীগ দাবি করে উক্ত স্থগিতাদেশ তুলে নিতে এবং (২) ডাকসু ডিপি জি.এস দুটি পদ ছাত্র ইউনিয়নের করতলগত থাকায় ছাত্র লীগ একটি অফিস দাবি করে তাদেরকে জি এসের অফিস (মোর্শেদ আলীর) ছেড়ে দিতে হয় ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলনের স্বার্থে।

ডাকের মাধ্যমে পাকিস্তান ব্যাপী সকল গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তি (এমনকি তৎকালীন জামায়াত- ইসলাম, নেজামে ইসলামসহ) এক ব্যাপকতম ঐক্যের মাধ্যমে সামরিক স্বৈরাচারী পাকিস্তানী সরকারকে চরম গণবিচ্ছিন্নতায় একঘরে করে তোলার লক্ষ্যে নির্ধারণ করা হয়- যা এক লোক এক ভোট অধিকার আদায় মাধ্যমে গণতন্ত্র অর্জনে সহায়ক হবে।

অপরপক্ষে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের নিজস্ব দাবি দাওয়া স্বায়ত্বশাসন, সর্বক্ষেত্রে বঞ্চনার অবসান অভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও সার্বজনীন শিক্ষানীতি, কৃষি- শিল্পনীতিতে কৃষক শ্রমিকের অধিকার নিশ্চয়তা, বৃহৎ শিল্প কারখানা জাতীয়করণ সমস্যার স্থায়ী সমাধান, স্বাধীন নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি প্রভৃতির ভিত্তিতে ছাত্র জনতার গণআন্দোলন গড়ে তুলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষার নিশ্চয়তার জন্য ১১ দফার আন্দোলন গড়ে তোলা অনিবার্য প্রয়োজন হয়ে উঠে। এজন্য গড়ে তোলা হয় স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটি (সেক)।

এভাবে সারা পাকিস্তানে গণতন্ত্র অর্জনে 'ডাক' আর পূর্ববঙ্গের বাঙালীসহ জনগণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জনের স্বতন্ত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনের 'সেক' পরস্পরের সম্পূরক ও পরিপূরক হয়ে উঠে। (চলবে)

জেলা কমিটির প্রতি অনুরোধ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা কমিটিসমূহকে জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন ও হামলার ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষদ বার্তার সম্পাদকীয় কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে ছবি ও স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সংযুক্ত করে পাঠালে তা পরিষদ বার্তায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

৫ ফেব্রুয়ারি ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও উপদেষ্টামণ্ডলীর যৌথ সভা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

আগামি ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শুক্রবার সকাল ১০টায় ঢাকার পুরানা পল্টনস্থ (কমরেড মনি কমরেড সিংহ সড়ক) মণি সিংহ-ফরহাদ ট্রাস্ট ভবনের ৫ম তলার শহীদ তাজুল মিলনায়তনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও উপদেষ্টামণ্ডলীর যৌথ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সভায় আলোচ্য বিষয় হলো- (ক) বিগত মহাসমাবেশের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা, (খ) আগামি কেন্দ্রীয় সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ, (গ) গঠনতন্ত্র সংশোধনী সংক্রান্ত উপ-পরিষদ গঠন, (ঘ) ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিরূপণ। যেহেতু, প্রতিটি জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সেহেতু ৫ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য বর্ধিত সভায় তাঁদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে নতুন বাধা

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে রিট করার কোনো প্রশ্ন উঠবে না।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন সুব্রত চৌধুরী, শামসুল হুদা, কাজল দেবনাথ, তবারক হোসেন, আবু ওবায়দুর রহমান ও এস এম রেজাউল করিম।

এদিকে বাতিল করা 'খ' তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি (যে সম্পত্তি সরকারের হাতে নেই) দাবিদারের আবেদনের সময় তিন মাস বাড়ল। এখন ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

সংখ্যালঘুদের জমি দখলে সাংসদ ও মন্ত্রীর সংশিষ্টতার অভিযোগ

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

হামলা করা হয়। পুলিশ এসব জেনেও এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, 'শুধু ঠাকুরগাঁও নয়, সারা দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখলের একের পর এক এ ধরনের ঘটনা এবং তাতে প্রশাসনের নীরব ভূমিকা দেখে আমরা হতবাক হচ্ছি।'

লিখিত বক্তব্য শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে এক প্রশ্নের জবাবে সুলতানা কামাল বলেন, ঠাকুরগাঁওয়ের ঘটনায় সাংসদ দবিরুল ইসলাম সরাসরি জড়িত।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, বিগত কয়েক মাসে ঝালকাঠি, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, মুন্সিগঞ্জসহ কয়েকটি জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসবের সঙ্গে সরকারের সাংসদ-মন্ত্রীর জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রশ্নোত্তর পর্বে এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথ বলেন, পিরোজপুরের সাংসদ এ কে এম এ আউয়ালও একইভাবে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন করছেন। দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ক্ষত্রিয় পরিবারের ৫৫টি পরিবারের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন হচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িত সাংসদ ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

এসব বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগে মামলা না করে ঢালাও অভিযোগ করা হচ্ছে। সত্য ঘটনা যদি হয়ে থাকে তবে তাঁরা আইনের আশ্রয় নিচ্ছেন না কেন? তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পুলিশ বা সরকারের কাছে এলে সরকার গুরুত্ব দিয়ে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে।

সাতকানিয়ায় ধর্মসভা

॥ চট্টগ্রাম থেকে সংবাদদাতা ॥

গত ২১ জানুয়ারি চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় আমিলাইশ কালী বাড়িতে ৩০ তম মহোৎসব উপলক্ষে এক ধর্মসভা প্রবীণ শিক্ষক নারায়ন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সাতকানিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দীন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী, প্রধান বক্তা দৈনিক ২১ প্রতিদিন এর সম্পাদক সুখময় চৌধুরী বাবু।

তাপসানন্দ গিরি মহারাজ সভা উদ্বোধন করেন ও সঞ্চালনা করেন প্রবাল চৌধুরী।

সভায় বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা সমর চৌধুরী, মাস্টার ইন্দুভূষণ চৌধুরী, অ্যাডভোকেট মনোরঞ্জন দাশ, শম্ভু দাশ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি জিয়াউর রহমান, চন্দন দাশ, স্বপন ভট্টচার্য্য, খোকন চৌধুরী, উত্তম নন্দী প্রমুখ। প্রধান অতিথি বলেন, ধর্ম মানুষকে পরিশুদ্ধ করে বলেই নৈতিকতা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে যার যার ধর্ম চর্চার মাধ্যমে এ'পৃথিবীতে মানবতাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

পরিশেষে শিল্পী রন্টি দাশের পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

সারাদেশে প্রতিবাদ, প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিবাদন গ্রহণ করুন। জাতীয়-আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞায় মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশকে যে গৌরবোজ্জ্বল ও সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে আপনি উন্নীত করেছেন তজ্জন্যে জানাই সুগভীর কৃতজ্ঞতা।

আপনার সবিনয় অবগতির জন্যে জানাতে চাই, বিগত বছরের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এক বিশাল মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সারা দেশ থেকে প্রায় লক্ষাধিক প্রান্তিক জনতার উপস্থিতি ঘটেছিল। অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার তাগিদে মূলত এ মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যেখান থেকে জাতীয় ঐকমত্যের ৭-দফা দাবি গৃহীত হয়, যার মধ্যে রয়েছে- রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ। বস্তুতঃ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় গণতন্ত্র, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে বাংলাদেশের অভিযাত্রাকে অধিকতর নিশ্চিত করার লক্ষে এসব দাবি প্রণীত ও গৃহীত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আমরা গভীর দুঃখ ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, একটি সংগঠন ধর্মীয় লেবাস পড়ে এবং আপনার নেতৃত্বাধীন সরকারি দলের অংগ সংগঠনের পরিচয়ে নিজেদেরকে পরিচিত করিয়ে এ মহাসমাবেশের সফলতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে নানান ধরনের অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে এবং ৭১-র মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে হানাদার দখলদার বাহিনীর সহযোগী পাকিস্তানি দালালদের একই সুরে কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে ব্যাহত করতে সচেষ্ট রয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবির আড়ালে তারা কার্যত বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

৪৭-পরবর্তী সময়ে বিগত সাত দশকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সিনিয়র বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি পদে আসীন করা ছিল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। আমরা এ জন্যে আপনাকে আন্তরিক অভিবাদন জানাই। দল-মতনির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণও একে স্বাগত জানিয়েছিল। এহেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইতিবাচক ভূমিকা কেবল আপনার পক্ষেই নেয়া সম্ভব। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে চাই, আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শের পক্ষে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি তাদের নেত্রী বলে দাবিদার ধর্মীয় লেবাসধারী এ সংগঠন আপনার সু-মহান আন্তরিকতা ও সদিচ্ছাকে প্রশ্ন তোলার ধৃষ্ঠতা দেখিয়ে এ মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, সংখ্যাগুরু মুসলমানের দেশে হিন্দু প্রধান বিচারপতি কেন? তারা মাননীয় প্রধান বিচারপতির অপসারণেরও দাবি জানিয়েছে। সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ-পদোন্নতিতে ধর্মীয় বৈষম্যের খানিকটা ইতিবাচক পরিবর্তন তাদের ভাষায় “হিন্দুতোষণ”। শুধু তা-ই নয়, গত ২৪ ডিসেম্বর’২০১৫ তারিখ তারা ৭১-র ঘাতক রাজাকারদের সুরে পাঠ্যপুস্তক থেকে হিন্দু লেখকদের লেখা বাতিলসহ চলমান শিক্ষানীতিকে ‘ইসলামবিরোধী’ উলেখে তা’ বাতিলের দাবি জানিয়েছে, পহেলা বৈশাখ বিরোধী বক্তব্য-বিবৃতিও দিয়েছে। অথচ আপামর বাঙালির সর্বজনীন নববর্ষের এই উৎসবকে অধিকতর প্রাণবন্ত, আনন্দমুখর ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্যে আপনার নেতৃত্বাধীন সরকার সম্প্রতি ঘোষিত বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের জন্যে ২০% উৎসব ভাতা ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা লীগের ভাষায় নতুন শিক্ষানীতিতে চারুকলার নামে নাকি নৃত্য, যাত্রা, সিনেমা ও হিন্দুদের ব্রতচারী শিক্ষা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মহাসমাবেশের পর এ সংগঠনকে দেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম-র বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ তুলে নিষিদ্ধের দাবি তোলার স্পর্ধাও দেখিয়েছে। অথচ কে না জানে, ৮৮-র তথাকথিত ভোটারবিহীন নির্বাচনে নির্বাচিত স্বৈরাচারের পার্লামেন্টে কথাকথিত রাষ্ট্রধর্ম বিল গৃহীত হলে আপনার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন ৮-দলীয় জোটসহ প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এর প্রতিবাদে সারা দেশে হরতালের ডাক দিয়েছিল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আওয়ামী ওলামা লীগ নামধারী এ সংগঠন বাংলাদেশের পোড়খাওয়া তুখোড় রাজনীতিক বিশিষ্ট সাংসদ এ্যাডভোকেট সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও ঐক্য পরিষদের অন্যতম চেয়ারম্যান মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার বীরউত্তম সি আর দত্তের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার চালাতেও দ্বিধা করেনি। আওয়ামী ওলামা লীগ নামধারী এ সংগঠন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে ‘ইসলামী বাংলাদেশ’ পরিচয়ে সংবিধানবিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডও পরিচালনা করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

যে কোন সংগঠন যে কোন দাবি তুলতেই পারে। কিন্তু সরকারি দলের নাম ভাঙ্গিয়ে সরকার বিরোধী, দেশবিরোধী, ধর্মবিরোধী যে অপতৎপরতা আওয়ামী ওলামা লীগের নামে চালানো হচ্ছে তাতে শান্তিপ্রিয় জনমনে ইতিমধ্যেই নানান প্রশ্ন ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে, জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। সরকার ও সরকারি দলের ভাবমূর্তিও এতে ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। কিছুদিন আগেও বিগত ১৭ অক্টোবর এ দলের দু’পক্ষের প্রকাশ্যে বিরোধে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে ‘জঙ্গী’ হিসেবেও আখ্যায়িত করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে জনগণের বিভ্রান্তি নিরসনার্থে প্রকৃত অর্থে এ সংগঠন সরকারি দলের আদৌ অংগ সংগঠন কিনা এবং তাদের বক্তব্য সরকারি দলের বক্তব্য কিনা সে ব্যাপারে আপনার নেতৃত্বাধীন সরকারি দলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্যের আবেদন জানিয়ে আজকের এ স্মারকলিপি আপনার বরাবরে প্রদান করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আমরা আপানার সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন আন্তরিকতার সাথে কামনা করছি।

চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর চট্টগ্রাম জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক মেজবাহ উদ্দীন এর মাধ্যমে গত ১৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ও মহানগর কমিটি কর্তৃক এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। অসাম্প্রদায়িকতার ছদ্মাবরণে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে উত্থান রোধ ও আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কথিত ওলামা লীগের মতো মৌলবাদী শক্তি প্রতিহত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার পরিমল চৌধুরী, রণজিত কুমার চৌধুরী, তাপস হোড়, এ্যাডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, এডভোকেট চন্দন বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী, দিলীপ মজুমদার, এ্যাডভোকেট সরোজ সিংহ হাজারী মানিক, এ্যাডভোকেট হরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রশান্ত, অধ্যক্ষ বিজয় লক্ষ্মী দেবী, সুভাষ দাশ, অনুপ রক্ষিত, ডাঃ চন্দন দত্ত, অসীম দেব, বিকাশ মজুমদার, জিতেন গুহ, তাপস দে, হরিপদ চৌধুরী বাবুল, রাজু দাশ হিরো, সাজিব বৈদ্য, সরোজ চৌধুরী প্রমুখ।

পটুয়াখালী

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ-এর বিরুদ্ধে আওয়ামী ওলামা লীগ সুকৌশলে এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে। তারা ইসলামী বাংলাদেশ পরিচয়ে সংবিধান বিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা মূলক বক্তব্য দিচ্ছে। এরই প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নিকট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি পেশ করেছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ পটুয়াখালী জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।

১৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ পটুয়াখালী জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ স্মারকলিপি দেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য এ্যাড. তারক চন্দ্র সাহা, জেলা শাখার সভাপতি অতুল চন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার দাস, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য তপন কর্মকার, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক শিশির চক্রবর্তী, সদস্য নিতাই শীল নয়ন, সুজয় চক্রবর্তী বিমল রক্ষিত প্রমুখ। জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম। স্মারকলিপিতে আওয়ামী ওলামা লীগ নামধারী সংগঠনটি আদৌ আওয়ামী লীগের সংগঠন কিনা এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে সদাশয় সরকারের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছে। [ছবি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়]

মিথ্যা কুরুচিপূর্ণ অপপ্রচার চালিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে হটানো যাবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করুন। খ্রিস্টীয় (ইংরেজী) নববর্ষের শুরুতে আপনাদের সবাইকে একই সাথে জানাই বিনম্র অভিবাদন।

সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আপনারা জানেন, বিগত বছরের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এক বিশাল মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যাতে সারা দেশ থেকে প্রায় লক্ষাধিক প্রান্তিক জনতার উপস্থিতি ঘটেছিল। অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার তাগিদে মূলত এ মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যেখান থেকে জাতীয় ঐকমত্যের ৭-দফা দাবি গৃহীত হয়। এই ৭-দফা দাবির মধ্যে রয়েছে- রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সমমর্যাদা, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ। বস্তুতঃ মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় গণতন্ত্র, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে বাংলাদেশের অভিযাত্রাকে অধিকতর নিশ্চিত করার লক্ষেই দাবি প্রণীত ও গৃহীত হয়।

সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আমরা গভীর দুঃখ ও উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, একটি সংগঠন ধর্মীয় লেবাস পরে এবং সরকারি দলের অংগ সংগঠনের পরিচয়ে নিজেদেরকে পরিচিত করিয়ে এ মহাসমাবেশের সফলতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে নানান ধরণের অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে এবং ৭১-র মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে হানাদার দখলদার বাহিনীর সহযোগী পাকিস্তানি দালালদের একই সুরে কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে ব্যাহত করতে সচেষ্ট রয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবির আড়ালে তারা কার্যতঃ বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

৪৭-পরবর্তী সময়ে বিগত সাত দশকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সিনিয়র বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি পদে আসীন করা ছিল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। আমরা এ জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিবাদন জানাই। দল-মতনির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ একে স্বাগত জানায়। এহেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ইতিবাচক ভূমিকা কেবল তাঁর পক্ষেই নেয়া সম্ভব। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে চাই, আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শের পক্ষে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের নেত্রী বলে দাবিদার ধর্মীয় লেবাসধারী এ সংগঠন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতা ও সদিচ্ছাকে প্রশ্ন তোলার ধৃষ্ঠতা দেখিয়ে এ মর্মে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, সংখ্যাগুরু মুসলমানের দেশে হিন্দু প্রধান বিচারপতি কেন? তারা মাননীয় প্রধান বিচারপতির অপসারণেরও দাবি জানিয়েছে। সরকারি চাকরিতে নিয়োগ-পদোন্নতিতে ধর্মীয় বৈষম্যের খানিকটা ইতিবাচক পরিবর্তন তাদের ভাষায় ‘হিন্দু তোষণ’। শুধু তাই নয়, গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ তারা ৭১-র ঘাতক রাজাকারদের সুরে পাঠ্যপুস্তক থেকে হিন্দু লেখকদের লেখা বাতিলসহ চলমান শিক্ষানীতিকে ইসলামবিরোধী উলেখে তা’ বাতিলের দাবি জানিয়েছে, পহেলা বৈশাখ বিরোধী বক্তব্য-বিবৃতিও দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উলেখ করতে চাই, আপামর বাঙালির সার্বজনীন নববর্ষের এই উৎসবকে অধিকতর প্রাণবন্ত, আনন্দমুখর ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্যে সম্প্রতি ঘোষিত বাজেটে সরকারি কর্মচারিদের জন্যে ২০% ভাগ উৎসব ভাতা ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা লীগের ভাষায় নতুন শিক্ষানীতিতে চারুকলার নামে নাকি নৃত্য, যাত্রা, সিনেমা ও হিন্দুদের ব্রতচারী শিক্ষা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মহাসমাবেশের পর এ সংগঠনকে দেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম-র বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ তুলে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলার স্পর্ধা দেখিয়েছে। অথচ কে না জানে, ৮৮-র তথাকথিত ভোটারবিহীন নির্বাচনে নির্বাচিত স্বৈরাচারের পার্লামেন্টে তথাকথিত রাষ্ট্রধর্ম বিল গৃহীত হলে তৎকালীন সকল রাজনৈতিক দল এর প্রতিবাদে সারা দেশে হরতালের ডাক দিয়েছিল।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আওয়ামী ওলেমা লীগ নামধারী এ সংগঠন বাংলাদেশের পোড়খাওয়া তুখোড় রাজনীতিক বিশিষ্ট সাংসদ এ্যাডভোকেট সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার বীর উত্তম সি. আর. দত্তের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার চালাতেও দ্বিধা করে নি। আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, কোন প্রকার মিথ্যা, কুরুচিপূর্ণ, ভিত্তিহীন, অপপ্রচার চালিয়ে আপামর ধর্মীয়-জাতিগত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের সম অধিকার ও সম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে কিছুতেই বিচ্যুত করা অতীতেও যায় নি, ভবিষ্যতেও যাবে না। (দ্বিতীয় কলামে দেখুন)

(তৃতীয় কলামের পর)

অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষে সকল প্রকার ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলনও এগিয়ে যাবে। আওয়ামী ওলামা লীগ নামধারী এ সংগঠন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে ‘ইসলামী বাংলাদেশ’ পরিচয়ে সংবিধানবিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকান্ডও পরিচালনা করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

যে কোন সংগঠন যে কোন দাবি তুলতেই পারে। কিন্তু সরকারি দলের নাম ভাঙ্গিয়ে যে সরকারবিরোধী, দেশবিরোধী, ধর্মবিরোধী অপতৎপরতা আওয়ামী ওলামা লীগের নামে চালানো হচ্ছে তাতে শান্তিপ্রিয় জনমনে ইতিমধ্যেই নানান প্রশ্ন ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে, জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। সরকার ও সরকারি দলের ভাবমূর্তিও এতে ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। কিছুদিন আগেও বিগত ১৭ অক্টোবর এ দলের দু’পক্ষের প্রকাশ্য বিরোধে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে জঙ্গি হিসেবেও আখ্যায়িত করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে জনগণের বিভ্রান্তি নিরসনার্থে প্রকৃত অর্থে এ সংগঠন সরকারি দলের আদৌ অংগ সংগঠন কিনা এবং তাদের বক্তব্য সরকারি দলের বক্তব্য কিনা সে ব্যাপারে সরকারি দলের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বক্তব্যের দাবি জানিয়ে আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্যের সমাপ্তি টানছি।

আপনাদের সবাইকে আবারো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ধন্যবাদান্তে- রানা দাশগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক

বিচিন্তা

আমার আমি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

স্বাধীন বাংলা ষড়যন্ত্র মামলা :

১১ ডিসেম্বর ৬৮ তারিখে আমার বিরুদ্ধে "স্বাধীন বাংলা ষড়যন্ত্র মামলা" রুজু করা হয়। পাকিস্তান সরকার বনাম পঙ্কজ ভট্টাচার্য জারি করা এই মামলায় আমাকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ৫নং খাতায় রাখা হয়। সেখানে ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, রাশেদ খান মেনন, মহীউদ্দীন আহমেদ রাজশাহী প্রমুখদের জেল মেট হিসাবে আমি ঠাঁই পাই। এরই মধ্যে একদিন জানতে পারি নাগা নেতা ফিজো কারাগারে পাক সরকারের- মেহমান হিসাবে চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় সমাহারে রসে বসে দিন গুজরান করছিলেন রাজকীয়ভাবে, এমনকি সন্ধ্যায় পর লক আপ থেকে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী ঐ নেতাকে সরকারি নিরাপত্তা দিয়ে রহস্যজনক অভিসারে পাঠানো হতো বলে ফালতু-মেট পাহারা ও বন্দী-বান্ধব পুলিশদের কাছে জানতে পারি। এক দিন হঠাৎ হৈ হৈ রৈ রৈ কান্ড। হাজতী-কয়েদীদের হল্লা- চিল্লার অন্ত নেই। জানা গেল ফিজোর কারণে কারাগার প্রায়-বিড়াল-শূন্য হতে চলেছে। বিড়ালের মাংস নাগাদের যতই প্রিয় খাদ্য হোক না কেন- জেলের হাজতী কায়েদীদের প্রিয় বন্ধু-সহচর-স্বজন বিড়াল বাহিনীর বিলুপ্তি কখনও তারা মেনে নিতে পারে না। হাজতী-কয়েদীদের প্রতিবাদের কারণে তাৎক্ষণিক প্রতিকার পাওয়া গেল, নাগানায়ক ফিজোকে সরকারি রেস্ট হাউসে বদলি করা হোল।

প্রাসঙ্গিক ১৯৬৪ সনে চট্টগ্রাম কারাগারের অনুরূপ এক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। পাকিস্তান সরকারের মেহমান হিসাবে চট্টগ্রাম কারাগারে রাজকীয় জীবন যাপন করতেন একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী বর্মী সশস্ত্র দলের নেতা। আরাকানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাক সরকারের সহযোগিতায় প্রভাব বলয় বাড়াতে তিনি ছিলেন কর্মরত। বর্মার হাত মোচরাতে পাক শাসকচক্র তাকে দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করতো। একারণে পাক মেহমান কাশেম রাজা জেলখানায় দাপুটে জীবন যাপন করতেন। জেলকর্তা ও নিরাপত্তা রক্ষীদের তিনি পাত্তা দিতেন না, তবে সম্মান করতেন রাজবন্দীদের। সহ কারাবন্দি হিসাবে তাঁর সাথে আলাপচারিতায় জেনেছি তার স্ত্রীর সংখ্যা মাত্র ১৬ জন, সন্তান সন্ততির সংখ্যা পৌনে একশত ছুঁই ছুঁই। আইয়ূব খান ষাটের দশকে কনভেনশন লীগ প্রতিষ্ঠা করতে কক্সবাজারে বিশাল সমাবেশ করেন যেখানে কাশিম রাজা কুড়ি বাসভর্তি স্ত্রী- পুত্র- পরিজন নিয়ে কনভেনশন মুসলিম লীগ যোগ দেন। চট্টগ্রামের নন্দন কাননের অপর্নাচরণ স্কুলের পিছনের গলিতে আজও কাশেম রাজার রেষ্টুরেন্টটি চালু রয়েছে। এখানে একটি দ্বিতল সিংহাসন রয়েছে যেখানে জীবিতকালে কাশেম রাজা ভক্ত- অনুরক্তদের সাক্ষাত দিতেন।

পাকিস্তান অনুসৃত ঐ ধারা এই সেই দিন পর্যন্ত বহাল ছিল, এখনও যার রেশ চলছে। দ:পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী উলফা, ত্রিপুরা- লিবারেশন টাইগার ও লিবারেশন ফ্রন্ট, আর. এস. ও (রোহিঙ্গা) আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট, মনিপুরী লিবারেশন ফ্রন্ট, ত্রিপুরা লিবারেশন ফ্রন্ট প্রভৃতি আশ্রয়-প্রশ্রয়-প্রাপ্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে অস্থিতিশীলতা ও বৈরীতা বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা অনুন্নত ও উন্নয়ন শীল দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতা, অস্ত্র-মাদক, জাল টাকা-সোনার চোরাচালান ব্যবসায়ের ঘাঁটি বানাতে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোকে ব্যবহার করে এসেছে।

পাকিস্তান অনুসৃত ঐ ধারা এই সেই দিন পর্যন্ত বহাল ছিল, এখনও যার রেশ চলছে। দ:পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী উলফা, ত্রিপুরা- লিবারেশন টাইগার ও লিবারেশন ফ্রন্ট, আর. এস. ও (রোহিঙ্গা) আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট, মনিপুরী লিবারেশন ফ্রন্ট, ত্রিপুরা লিবারেশন ফ্রন্ট প্রভৃতি আশ্রয়-প্রশ্রয়-প্রাপ্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলো প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে অস্থিতিশীলতা ও বৈরীতা বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা অনুন্নত ও উন্নয়ন শীল দেশগুলোতে অস্থিতিশীলতা, অস্ত্র-মাদক, জাল টাকা-সোনার চোরাচালান ব্যবসায়ের ঘাঁটি বানাতে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিদের ব্যবহার করে এসেছে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা :

১৯৬৮ জুন ১৮ তারিখে শুরু হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এতে ৩৩ জন বাঙালি আমলা, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ভারতের সহযোগিতায় পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন তথা স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র জড়িত থাকার অভিযোগ এনে তাদের গ্রেফতার করা হয় অনেক পূর্বেই। যেমন শেখ মুজিবকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ১৭ই জানুয়ারি ৬৮ তারিখে মুক্তি দিয়ে পুনরায় গ্রেফতার করে সেনানিবাসে আটক করা হয়। এই ষড়যন্ত্র মামলা ছিল পাকিস্তান সরকার বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও তার সঙ্গীরা যাদের মধ্যে ছিলেন লে:কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, আহমেদ ফজলুর রহমান ও রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, সাজেন্ট জহুরুল হক, মেজর শওকত আলী, কমান্ড্যান্ড আবদুর রউফ, মাহাবুব উদ্দীন চৌধুরী প্রমুখ।

১৯৬৮ জুন ১৮ তারিখে শুরু হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এতে ৩৩ জন বাঙালি আমলা, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ভারতের সহযোগিতায় পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন তথা স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র জড়িত থাকার অভিযোগ এনে তাদের গ্রেফতার করা হয় অনেক পূর্বেই। যেমন শেখ মুজিবকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ১৭ই জানুয়ারি ৬৮ তারিখে মুক্তি দিয়ে পুনরায় গ্রেফতার করে সেনানিবাসে আটক করা হয়।

এটি নিছক কল্পিত এক তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলা ছিল না। ছিল গণসংগ্রামের পাশাপাশি আঞ্চলিক সমর্থন সংগ্রহের এক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। ৬০ এর প্রথমাংশে রেজা আলী ও প্রকৌশলী মর্তুজা খানের সহযোগিতায় শেখ মুজিবর রহমান আগরতলায় গোপনীয়তার সাথে সফর করেন।

এই বিচার অনুষ্ঠানের ধারা বিবরণী পূর্ববঙ্গের জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তোলে এক নজীরবিহীন জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্ফোরণ। এ এক গণজাতীয়তাবাদ- যে চেতনায় প্রতিটি সাধারণ বাঙালি হয়ে উঠেন অসাধারণ।

ডাক ও সেক গঠন :

এই সময়ে পাক শাসকগোষ্ঠীকে তথা সামরিক স্বৈরাচারকে গণবিচ্ছিন্ন করে তোলার লক্ষে পাকিস্তান ভিত্তিক গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বাতাবরণ তৈরী করা হয়। যার নাম ছিল ডেমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটি বা ডাক। এটি গঠিত হয় ৮ জানুয়ারি। এর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মস্কো) সহ ৮টি রাজনৈতিক দলের সমবায়ে গঠিত হয় এই ডাক। ডাকের নেতারা পাকিস্তান ভিত্তিক গণআন্দোলন জোরদার করে তোলেন। পাশাপাশি পূর্ববঙ্গে আন্দোলনের যথাযথ কার্যকর ও জাগরণধর্মী অগ্রসর ভূমিকা পালনের জন্য গড়ে তোলা হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বা সেক। যা গঠিত হয় ১৯৬৮ সনের ৬ ডিসেম্বর ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), এন, এস, এফ এর দোলন গ্রুপ এর সমবায়ে। ডাকসু সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ সভাপতিত্ব করতেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় পদাধিকার বলে।

১১ দফার দাবি সনদ :

১৯৬৯ জানুয়ারি ৪ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার রূপরেখা জনসাধারণের মাঝে পেশ করা হয়। এগার দফা হলো: (১. ক) স্বচ্ছল কলেজগুলোকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে যেসব কলেজ প্রাদেশিকীকরণ করা হইয়াছে সেগুলোকে পূর্ববস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চ ক্লাসে ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে হইবে। কারিগরি, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি ছাত্রদের দাবি মানিতে হইবে। ছাত্র বেতন কমাইতে হইবে নারী শিক্ষা প্রসার করিতে হইবে। (১.খ) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় আইন সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করিতে হইবে। (১.গ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' ও 'হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট' বাতিল করিতে হইবে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমূখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে। (২) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে করিতে হইবে। (৩) নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিতে হইবে- (৩.ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেল শাসনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম। (৩.খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা, এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ। (৩.গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল বিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে, দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। (৩.ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সাথে সাথে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর পরীক্ষামূলক বিধান শাসনতন্ত্রের থাকিবে। (৩.ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিতে হইবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলো সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত হার অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদির বিনা শুল্কে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আমদানী- রফতানী করিবার অধিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে। (৩.চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষীবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ, নৌবাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে। (৪) পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতঃ সাব ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে। (৫) ব্যাংক, বীমা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে। (৬) কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহসিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০.০০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে। (৭) শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। (৮) পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৯) জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে। (১০) সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে। (১১) দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

মনে রাখা দরকার-এই দুরূহ কর্ম সম্পাদন সম্ভবপর হয়েছিল ১৯৬১ সনে তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার দুতিয়ালীতে অনুষ্ঠিত মুজিব-মনি সিংহের বৈঠকের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে।

প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, ১১ দফা কর্মসূচি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলন গড়ে তুলতে-কর্মীসমর্থকদের উৎসাহ সৃষ্টির দুটি অন্তরায়ের কথা ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ জানান। (১) জগন্নাথ কলেজে সংসদ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক জারীকৃত মামলায় স্থগিতাদেশ উঠিয়ে নিলে ছাত্রলীগ নির্বাচিত সংসদ ব্যবহার করতে পারে; দ্বিতীয় দাবিটি ছিল, আন্দোলন পরিচালনার স্বার্থে ছাত্র ইউনিয়নের এক্তিয়ারে থাকা ডাকসুর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের দুটি অফিসের মধ্যে ১টি অফিস ছাত্রলীগের কাজের জন্য দেওয়ার দাবিটিও পূরণ করা হয়েছিল। সে সময়ে ডাকসু সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মাহফুজা খানম এবং মোর্শেদ আলী। অত:পর ১১ দফার গণছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে আর কোন বাধা ছিল না।

আমি সৌভাগ্যবান ন্যাপের শত শত ত্যাগী পৃষ্ঠা ৬

বিচিন্তা

গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

অজয় রায়

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনে শত্রু সম্পত্তি আইন কোন মাত্রায় সমস্যা সৃষ্টি করছিল তা আজ আর কথা বলে বোঝাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। কিন্তু যখন শত্রু সম্পত্তি আইনের নাম বদলে তা অর্পিত সম্পত্তি আইনের নামে বাস্তবে নতুন করে অব্যাহত রাখা হলো তখন বিষয়টা যে শুধু আইনের শিরোনামের রদবদল সে বিষয়টি বলে বোঝাবার দরকার ছিল। সেই প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকেই ১৯৭৮ সালে যাত্রা শুরু হলো অর্পিত সম্পত্তি আইনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করা এবং আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টার মধ্য থেকেই ১৯৭৮ সালে রমনা পার্কে এক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয় অর্পিত সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধকল্পে এক সংগঠন গঠনের জন্য যে সম্মেলন হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য। সম্মেলনে মেজর জেনারেল (অবঃ)ওসমানিসহ অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন সেদিন। যে সংগঠন সেদিন গঠিত হয়েছিল তার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন জনাব আমিনুল হক। তিনি ছিলেন সে সময়ে এটর্নী জেনারেল।

এই ইতিহাসটুকু স্মরণ করে লেখাটা শুরু করছি কারণ পরে ১৯৮৮ সালে যখন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গঠিত হয় তখন কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন শুধু হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কেন তার সাথে মুসলমান যোগ করলেই তো ভাল হতো। আর তা বলতে গিয়ে যাঁরা আপত্তি তুলছিলেন তাঁরা অব্যবহিত আগে অর্পিত সম্পত্তি আইনের বিরুদ্ধে যে পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়েছি তার কাঠামোর দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গঠিত হবার পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ তার কার্যক্রমের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সমস্যা যেমন সরকার তথা দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করে তার সমর্থনে জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে ঠিক তেমনি গণতন্ত্র তথা সমাজ প্রগতির জন্য দেশবাসীর সংগ্রামে সাধ্যমত শরিক থেকে সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। কারণ একটি দেখা প্রথম থেকে এই সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট ছিল তা হলো দেশে যদি সার্বিক গণতন্ত্রায়নের ধারা অগ্রসর না হয় তাহলে ধর্মীয় তথা জাতীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। আর গণতন্ত্রের ধারা গভীর করে তোলার জন্য যে বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হলো সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চেতনাকে পিছনে ফেলে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তৃতি সাধন। যে বিষয়টি এই প্রসঙ্গে উলেখ্য তা হলো নানা মত ও পথের সংশেষণধর্মীতা এ দেশের হাজার বছরের বাঙালির ঐতিহ্য। তাছাড়া ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত পরিচয়ের ভিত্তিতে যখন ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হলো তারই অঙ্গীভূত হয়েছিল আমাদের মাতৃভূমি আজকের বাংলাদেশ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে তার নেতৃবৃন্দ যাই বলে থাকুন না কেন, কিছুদিন যেতে না যেতেই এ দেশের মানুষের কাছে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো তা হলো যতই ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে সহমর্মিতা তথা ভ্রাতৃত্বের শোগান দেয়া হোক না কেন এ দেশের মানুষের উপর সাম্রাজ্যবাদী ধাঁচের শোষণ চাপিয়ে দেয়াটাই ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের উদ্দেশ্য। আর সেজন্যই ক্রমে ভাষা, স্বায়ত্বশাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো এবং ক্রমে পরিণত হলো স্বাধীনতার দাবিতে মুক্তিযুদ্ধে- সেই সংগ্রামের ধারার চরিত্র প্রথম থেকে ছিল অসাম্প্রদায়িক। সেই বিষয়টি ধর্মীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু সমাজের কাছেও ছিল স্পষ্ট। সেজন্যেই ১৯৫৬-৫৭ সালে এ দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির সপক্ষে মত দিয়েছিল এবং যার মাধ্যমে সেদিন প্রবর্তিত হয়েছিল যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি। এই পদক্ষেপ যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল সে ব্যাপারে এ দেশেই প্রতিটি সচেতন ব্যক্তি একমত হবেন আশা করি।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গঠিত হবার পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ তার কার্যক্রমের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সমস্যা যেমন সরকার তথা দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করে তার সমর্থনে জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে ঠিক তেমনি গণতন্ত্র তথা সমাজ প্রগতির জন্য দেশবাসীর সংগ্রামে সাধ্যমত শরিক থেকে সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। কারণ একটি দেখা

প্রথম থেকে এই সংগঠনের নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট ছিল তা হলো দেশে যদি সার্বিক গণতন্ত্রায়নের ধারা অগ্রসর না হয় তাহলে ধর্মীয় তথা জাতীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। আর গণতন্ত্রের ধারা গভীর করে তোলার জন্য যে বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হলো সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চেতনাকে পিছনে ফেলে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তৃতি সাধন।

যে বিষয়টি এই প্রসঙ্গে উলেখ্য তা হলো নানা মত ও পথের সংশেষণধর্মীতা এ দেশের হাজার বছরের বাঙালির ঐতিহ্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে এটাই যখন এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাহলে ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিতে আলাদা সংগঠন কেন? আর সে প্রশ্নটি আলোচনাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলেও আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে ইতিহাসের গভীরে। নানা কারণেই যখন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি উত্থাপিত হলো তখন তা ঐ সম্প্রদায়ের মাঝে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ব্যাপকভাবে। বাংলা সম্পর্কে এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জনপ্রিয়তার ব্যাপকতা এত বেশি ছিল যে শেরে-বাংলার মত ব্যক্তিও পাকিস্তান দাবির বিরোধীতার জন্য নিগৃহীত হয়েছিলেন মুসলিম ছাত্র-যুবকদের হাতে। অথচ বাংলার মুসলিম ছাত্র-যুবকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এককভাবে শেরে-বাংলার ভূমিকা যে অতুলনীয় তা সর্বজনবিদিত। ধর্মভিত্তিক জাতীয় পরিচয়ের এরূপ ব্যাপ্তির জন্য অবশ্য সেদিন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অদূরদর্শী ভূমিকাও যে কম দায়ী নয় ইতিহাসের পাঠক মাত্রই তা অবগত। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার এই প্রভাবের নেতিকরণ করেই অবশ্য এ দেশের ব্যাপক জনগণের মাঝে ভাষা ভিত্তিক জাতীয় চেতনা ক্রমে দানা বেঁধে উঠতে থাকে এবং তাই ক্রমে পরিণতি লাভ করে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলা দেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে।

তবে তারপরও এই প্রসঙ্গে যে কথাটি বিশেষভাবে উলেখ্য তা হলো ধর্মভিত্তিক জাতীয় চেতনার প্রভাব জনচিত্তে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তা যে আজও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' নামক মতবাদের ব্যাপকতা তারই সাক্ষ্য বহন করে। তাদের কথা হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে লাহোর প্রস্তাবটি পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সেজন্যই তাঁরা এদেশের মানুষের জাতীয় পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে ধর্মীয় পরিচয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলে আখ্যায়িত করতে চান। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু এবং তার পর ঐ বছরের ৩ নভেম্বর তারিখে জেলে জাতীয় চার নেতাকে হত্যার মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশের গতিমুখের যে ধারা নির্দিষ্ট হয়েছিল তা পুরোপুরি পাল্টে দিয়ে সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা তথা রৰণশীলতার ধারায় পরিচালিত করার যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল তা একটানা ভাবে অব্যাহত ছিল প্রায় দুই দশক। এই সময় স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের চার মূল নীতিকে পরিবর্তন করে বিপরীতমুখী করার যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত থাকে প্রায় দুই দশক। আবার এই সময়ই হচ্ছে সেই সময়কাল যখন এ দেশের মধ্যবিত্তের বিকাশও ক্রমে উলেখযোগ্য গতিবেগ পেতে শুরু করে। আর এভাবে ধর্মভিত্তিক জাতীয় চেতনার ধারা দৃঢ় ভিত্তি পাবার ক্ষেত্র ক্রমে গভীর হতে থাকে। এ সময় আরও একটি ঘটনা ঘটে বিশ্বে। গত শতকের শেষ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা পূর্ব য়ুরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জে বিলুপ্তি যেমন সমগ্র বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপনে সাহায্য করে, তেমনি এ সময় প্রধানতঃ মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্ররোচনায় সমস্যা সৃষ্টি হয় মধ্যপ্রাচ্যে। সে অঞ্চলে ক্রমে উগ্র জঙ্গিবাদী শক্তির প্রভাব শুধু সে অঞ্চল নয় বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও আজ প্রভাব বিস্তার করতে প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের দেশও তাদের সে প্রচেষ্টার বহির্ভূত এলাকা ন্যায়। এখানেও তারা রক্ষণশীল ও উগ্র মনোভাবের বিস্তৃতি ঘটাবার চেষ্টা করছে।

ধর্মভিত্তিক জাতীয় চেতনার প্রভাব জনচিত্তে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তা যে আজও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' নামক মতবাদের ব্যাপকতা তারই সাক্ষ্য বহন করে। তাদের কথা হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃত অর্থে লাহোর প্রস্তাবটি পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সেজন্যই তাঁরা এদেশের মানুষের জাতীয় পরিচয়কে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে ধর্মীয় পরিচয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে তাকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলে আখ্যায়িত করতে চান। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু এবং তার পর ঐ বছরের ৩ নভেম্বর তারিখে জেলে জাতীয় চার নেতাকে হত্যার মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশের গতিমুখের যে ধারা নির্দিষ্ট হয়েছিল তা পুরোপুরি পাল্টে দিয়ে সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা তথা রক্ষণশীলতার ধারায় পরিচালিত করার যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল তা একটানা ভাবে অব্যাহত ছিল প্রায় দুই দশক।

আর এই পটভূমিতেই বিচার করতে হবে আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির প্রয়োজনেই হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সংগঠন ও প্রচেষ্টার প্রাসঙ্গিকতা।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বর্তমান বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অনুপাত ছিল শতকরা ৩০ ভাগের কিছু বেশী। আজ তা শতকরা ৮ ভাগের বেশী নয় বলে অনুমান করা হয়। প্রধানতঃ সম্পত্তি বেদখল অথবা নানাবিধ কারণে সৃষ্ট সমস্যাবলী তথা সমাজের এক শ্রেণির মধ্যে উগ্র ও সংকীর্ণ চেতনার বিস্তার এবং এ সবের বিপরীতে সংখ্যালঘুদের অধিকার তথা জীবন-জীবিকার সুরক্ষার প্রয়োজনে বলিষ্ঠ এবং একনিষ্ঠ তথা ধারাবাহিক ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম এরূপ রাজনৈতিক শক্তির অনুপস্থিতি আজ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অস্তিত্ব ও সক্রিয়তাকে আরও প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। গণতান্ত্রিক ধারার বিকাশের জন্যই এটা প্রয়োজন।

এটা ঠিকই বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার এবং আওয়ামী লীগ অসম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠন তথা সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে তারপরও এটা সত্য জনসাধারণের মাঝে এই প্রশ্নে তাদের ধারাবাহিক সচেতন ভূমিকার অনুপস্থিতি তথা এই সংগঠনের পরিচয়ে একদল দুষ্কৃতকারী সময় সময় যে কাজ করে তা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারের সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রশাসনের ধারাবাহিক সক্রিয়তার অভাব অনেক সময়ই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনিশ্চয়তার মনোভাব বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাতে দেশত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

এর সাথে আছে আরেকটি সমস্যা। বিষয়টি নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু সমাজের কথা বলছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি এখন পর্যন্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া, বিশেষতঃ ভূমির অধিকার এবং সমতল ভূমির আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান না হওয়ায় উক্ত জনগোষ্ঠীর মাঝে অনিশ্চয়তার মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্চে। আর উভয় সমস্যাই বাংলাদেশে এখনো সক্রিয় এবং নানা ধ্বংসাত্মক কাজের মাধ্যমে সমস্যা সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মীয় ও জাতীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যাবলীর প্রতি নির্দিষ্টভাবে দৃষ্টিপাত করাটা জরুরী।

আর এখানেই আসে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ভুমিকায়। তারা যে দাবিসমূহ উত্থাপন করেছেন স্বদেশের গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য তার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে হবে। গণতান্ত্রিক শক্তির সবাইকে এই বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে আজ। গণতন্ত্রের প্রয়োজনেই বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।

এই সাথে অবশ্য আরও একটি কথা বলে লেখাটি ইতি টানবো। বিষয়টি হলো- নিজেদের কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতি ঠিক করার সময় সারা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার দিকটিকে বিবেচনায় নিতে হবে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা-কর্মীদের।

আর এ ভাবেই পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে যাবে গণতান্ত্রিক- অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কাফেলা।

অজয় রায় : লেখক ও রাজনীতিবিদ

ঠাকুরগাঁও-এ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বানে জেলা প্রশাসন চত্বরে অনশন ও বিক্ষোভ। ছবি : পরিষদ বার্তা

ঠাকুরগাঁওয়ে জমি জবরদখলের চেষ্টা ॥ হামলায় অনেকে আহত

জেলা প্রশাসন চত্বরে অনশন

॥ ঠাকুরগাঁ থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

ঠাকুরগাঁও সদর থানার বরুনাগাঁও মৌজার এস,এ ৪০৮ ও ১৬৯ নং খতিয়ান ভুক্ত ৩৩৩৬ নং দাগে ০.৮৯ একর ৩৩৬৭ নং দাগে ০.৩৩ একর, দুই নং দাগে মোট ১.২২ একর জমির রেকর্ডীয় মালিক ঘৃতনাথ বর্মণ ও অজেন্দ্র নাথ বর্মণ গং। জনৈক মোছাঃ আছিয়া, স্বামী–মৃত এজাহার উদ্দীন, সাং বরুনাগাঁও ১২/০৮/১৯৭৪ ইং তারিখে ১৬৩৫২ নং দলিল মূলে অজেন্দ্র বর্মণ, লালবাবু বর্মণ-এর কাছে থেকে ৩৩৬৭ নং দাগের ০.৩৩ একর, ২৯/০৮/৭৪ ইং তারিখে ১৬৭২৩ নং দলিল মূলে রাম প্রসাদ বর্মণ, রাম বাবু বর্মণের কাছ থেকে ৩৩৬৬ নং দাগের ০.৮৯ একরের মধ্যে ০.২৫ একর এবং ২৮/০৯/৭৪ ইং তারিখে ১৮৭১৯ নং দালিল মূলে পৈক্ষ্য বর্মণ, রাম প্রসাদ বর্মণ, রাম বাবু বর্মণ, যতীন্দ্র নাথ বর্মণ, মহীন্দ্র বর্মণের কাছ থেকে ৩৩৬৬ নং দাগের ০.৮৯ একর জমির মধ্যে ০.৪৫ একর মোট ১.০৩ একর জমি ক্রয় করেন।

উক্ত মোছাঃ আছিয়া বেগম উলেখিতভাবে তার ক্রয়কৃত জমির মধ্যে গত ১৭/১১৮২ইং তারিখে ৫৭৬০ নং দলিল মূলে রশিক লাল বর্মণ, কুলেশ্বর বর্মণের বরাবরে ৩৩৬৬ নং দাগের ০.৮৯ একর জমি মধ্যে ০.৫৬ একর ও ৩৩৬৭ দাগের ০.৩৩ একর জমি বিক্রি করেন। তাছাড়া এমতাবস্থায় মোছাঃ আছিসা বেগম ৩৩৬৬ নং দাগের ১১ শতক জমি সরাসরি এস,এ রেকর্ডী মৃত ঘৃতনাথ বর্মণের ছেলে বিপিন বর্মণের কাছে গত ০৬/১১/২০০১ ইং তারিখে ১২১৬৪ নং দলিল মূলে বিক্রয় করেন। এভাবেই এভাবে আছিয়া বেগম তার ক্রয়কৃত ১.০৩ একর জমির মধ্যে ১.০০ একর জমি বিক্রয় করেন। এমতাবস্থায় উক্ত আছিয়া বেগমের ছেলে আসাদুল কর্তৃক ভূমিদস্যুসহ উলেখিত দুটি দাগের ১.২২ শতক জমির হিন্দু মালিকদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে জবর দখল করে কাঁচা ঘর তৈরি করে।

এ অবস্থায় বিপিন বর্মণ নিরূপায় হয়ে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের বরাবরে আসাদুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। জেলা প্রশাসক সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য এসি ল্যান্ড ঠাকুরগাঁও সদরকে নির্দেশ দেন। সেই অনুযায়ী এসি ল্যান্ড ঠাকুরগাঁও সদর সরেজমিনে তদন্ত করে ও উভয় পক্ষের কাগজপত্র পর্যালোচনা করে গত ০২/১১/২০১৫ইং জেলা প্রশাসক বরাবরে লিখিত প্রতিবেদন প্রদান করেন। সেই প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়ে জেলা প্রশাসক গত ১৯/০১/২০১৬ইং তারিখে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে আসাদুলের কাঁচা ঘর ভেঙ্গে দিয়ে তাকে উচ্ছেদ করেন। এরপর আসাদুল ট্যাংক লরি শ্রমিক সংগঠনের সহায়তা নিয়ে ১৯/০১/২০১৫ইং তারিখে ঠাকুরগাঁও ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রশাসনের সঙ্গে দর কষাকষি করে এবং এক পর্যায় আসাদুলের সঙ্গে প্রশাসনের সমাঝোতা হয়। ২০/০১/২০১৬ইং তারিখ বিকাল অনুমান তিনটার দিকে আসাদুল তার বাহিনী নিয়ে উলেখিত ১.২২ একর জমি জবর দখল করতে গেলে হিন্দু-সম্প্রদায়ের লোকেরা বাঁধা দিলে আসাদুর ও তার দলীয় লোকেরা বাজারু বর্মণ, জয় বর্মণ, রিতা, গীতা, মায়া, রঞ্জনা, মঙ্গলী, প্রথমী, সাবিত্রী, সুমিত্রা, প্রমিলা, অনিবালাসহ আরো অনেককে শারীরিক নির্যাতন করে রক্তাক্ত জখম করে এবং এক পর্যায়ে আসাদুল ও তার দলীয় লোকেরা বিপিনের ঘরে আগুন দেয়। ফায়ার সার্ভিস গিয়ে আগুন নিভায় এবং পরিস্থিতি এমন ছিল যে, জখমপ্রাপ্ত হিন্দুরা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ পায়নি। এই ঘটনার প্রতিবাদে ২১ জানুয়ারি সকালে বরুনাগাঁও গ্রামে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃত্বে প্রায় ৫ শতাধিক মানুষ জেলা প্রশাসন ভবন চত্বরে সকাল থেকে অনশন কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় পুলিশ সুপার ও ওসি এসে একাত্মতা প্রকাশন করেন। স্থানীয় মুসলমানরাও এতে অংশ নেন। আসাদুল বরুনাগাঁও গ্রামের বিপিন বর্মণ তার পরিবারসহ অনেক শুভাকাঙ্খির বিরুদ্ধে গত ১৯ জানুয়ারি তারিখে ঠাকুরগাঁও থানায় মিথ্যা মামলা করে। যার ঠাকুরগাঁও থানার মামলা নং-৩৬–১৯/০১/২০১৬ইং পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, এই মিথ্যা মামলার আমাদের লোকেরাসহ আমাদের শুভাকাঙ্খিরা হয়রানির শিকার হলে ভবিষ্যতে আমাদের পক্ষে আরও কঠোর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে যাওয়া ছাড়া বিকল্প থাকবে না।

আমার আমি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

অগ্রজ নেতার সান্বিধ্য ও সাহচর্য আমি পেয়েছি যারা বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের মধ্যে রবী নিয়োগী (৩৩ বছর জেলে কাটান), কাজী আ: বারী (মার্শল লতে দণ্ডিত এবং বেত্রদণ্ডাঘাতের শিকার), মনিকৃষ্ণ সেন, শংকর বোস, নিরোদবিহারী নাগ, সাবেক এম.এল.এ. সৈয়দ আশরাফ হোসেন, সাবেক এম.পি.পীর হবিবুর রহমান, সাবেক এম.পি. চৌধুরী হারুনর রশীদ, সাবেক এম.পি. দেওয়ান মাহাবুব আলী, মহীউদ্দীন আহমেদ-সাবেক এম.পি. পরবর্তীতে আ: লীগ নেতা। সৈয়দ আলতাফ হোসেন সাবেক এম.পি, আহমেদুল কবীর সাবেক এম,পি, বিজয় চ্যাটার্জি সাবেক এম, এল, এ, পুর্ণেন্দু দস্তিদার সাবেক এম,এল, এ, আবদুল সাত্তার, মৌলানা আহমেদুর রহমান আজমী, আবদুল হাদী (নোয়াখালী), সাইফউদ্দীন খান, কবিয়াল ফনী বড়ুয়া, মিলন বড়ুয়া, আবদুস সাত্তার, আলতাব আলী (কৃষক নেতা), আবু আলী (নাটোর) মো: রকিব, কসিম উদ্দীন মন্ডল (নওগাঁ), গোলাম আরিফ টিপু- আতাউর রহমান- মহসিন প্রামাণিক বীরেন সরকার (রাজশাহী) তেজেন নাগ, আবদুস সাত্তার, হাসান আলী, মকবুলুর রহমান হেনা (দিনাজপুর) ডা: মালেক (ঠাকুরগাঁ) মো: হাফিজ (সৈয়দপুর) লুৎফর রহমান সাবেক এম, পি, মজিবর রহমান শনি (দিনাজপুর) দবীর উদ্দিন (নীলফামারী) মো: আফজাল, আজিজুল হক (সেলিমভাই) ও কৃষক নেতা ছয়ের উদ্দীন (রংপুর) শ্রমিক নেতা এম. এস. হক নেসারুল হক, এ্যাড.মোয়াজ্জেম হোসেন (চট্টগ্রাম) আতিয়ূর রহমান, আবু জাফর, ব্যারিষ্টার আব্দুল হক (চুয়াডাঙ্গা) শহীদুল ইসলাম (দর্শনা) আমিনুল ইসলাম বাদশা (খাপড়া ওয়ার্ডে গুলিবিদ্ধ) পাবনা। এ্যাড. আব্দুল রাজ্জাক- আ: শহীদ লাল (যশোর) তারা মিয়া- আব্দুল হামিদ- বরুন রায় (সিলেট) আব্দুল হাই চৌধুরী সাবেক এম, পি, (হবিগঞ্জ) মাহাবুব উদ্দীন চোধুরী (আগরতলা মামলা) কমান্ডার আব্দুল রউফ (আগরতলা মামলা) এডভোকেট তোফাজ্জল হোসেন- ঝিনাইদহ, উসুয়ে তালুকদার (কলাপাড়া) ভাষা সৈনিক, রণেশ মৈত্র ভাষা সৈনিক (পাবনা) - রওশন আলী (কুষ্টিয়া), প্রসেনজিত বসু- বাবুয়া বোস, মোজাম্মেল হক (মেহেরপুর) আজিজুল ইসলাম খান ,ওয়াজেদ আলী (নেত্রকোনা) মৃণাল বারুড়ি (মাদারীপুর) চিত্ত ঘোষ (ফরিদপুর) চৌধুরী খোরশেদ আলম (শিক্ষক নেতা) এ, টি, এম, সামসুদ্দীন (ন্যাপ নেতা- সাংবাদিক) নূরন্নবী- নুরুল আমিন (চট্টাগ্রাম) মোশারফ হোসেন মন্ডল, মোখলেসুর রহমান, দূর্গাদাশ মুখার্জী, হারুনর রশিদ, মীর শহীদ ইকবাল, মোফাজ্জল হোসেন দুলু ভাই (বগুড়া) আবুল হাশেম, ফয়েজ মাস্টার, আবদুল হাই, সামসুল হক, ফজলুল হক খোন্দকার (নরসিংদী) কামাল হায়দার সাবেক এম, পি, (নরসিংদী) গঙ্গেঁশ সরকার (তড়াইল) শফিউল আলম বেবী শফি, এমদাদুল ইসলাম (চট্টগ্রাম) সিরাজুল ইসলাম, মো: ইদ্রিস, অধ্যাপক মোস্তাক আহমদ চৌধুরী (কক্সবাজার) জীবন কানাই চক্রবর্তী, আবদুস সাত্তার (চাঁদপুর) অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার ও এ্যাড. আব্দুস সোহবান, মোয়াজ্জেম হোসেন, কল্যাণ চৌধুরী (জামালপুর) নুরুল ইসলাম (চাটখিল) ধীরেন মন্ডল (মুন্সীগঞ্জ) সিরাজুল হক- মনীন্দ্র গোস্বামী- গাজীপুর, সুন্দর আলী (টঙ্গী) হাতেম আলী (কৃষক নেতা- টাঙ্গাইল) এবং আবদুল বাকী, খোন্দকার কামাল প্রমুখ। আবুল কাশেম (শেরপুর) সরদার আবদুল হালিম, ওসমান গণি, আশরাফ আলী (ঢাকা শহর) কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস (সম্পাদক, পূর্বদেশ ও ন্যাপ নেতা, মুজিবর রহমান টুনু (সম্পাদক নতুন বাংলা) কালীদাশ রায়-এডভোকেট আবদুস সামাদ (ভাষা সৈনিক) ব্রাহ্মনবাড়িয়া, এ্যাডভোকেট মুজিবর রহমান, আরব আলী, নুরুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট সামসুল হক, এডভোকেট এস, এম, এ, সবুর, মো: মনসুর, দ্বিজবর ডাকুয়া (বাগেরহাট) সাইফুল ইসলাম (সিরাজগঞ্জ) মীর শহীদ মন্ডল, আবদুল বাকী মন্ডল (জয়পুরহাট) সৈয়দ আনোয়ার চৌধুরী, ক্যাপ্টেন (অব) আবদুল হালিম, দেলোয়ার হোসেন, এ্যাডভোকেট মো: সামসুদ্দীন, ডা: চিত্ত সাহা, প্রমথ নন্দী, প্রমথ সরকার, সমর ঘোষ, বেলায়েত হোসেন, বংশীবদন সাহা, ফজলুল হক (মানিকগঞ্জ) আবু মো: ফেরদৌস, এম, এ, রব, দীন মোহাম্মদ, সামসুর রহমান (শুনু) (খুলনা) ইদ্রিস দেওয়ান, জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, খান মজলিস, ফখরুল (ফকু) (ঢাকা জেলা) জয়নাল আবেদীন (বরগুনা), আলী হায়দার খান (পিরোজপুর) জয়নাল আবেদীন (ভোলা) প্রমুখেরা।

অবশ্যই অগ্নিকন্যা ন্যাপনেত্রী পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী, ন্যাপের মহীউদ্দিন আহমেদ নামে আওয়ামী লীগ নেতা হিসাবে পরিচিত (মঠবাড়িয়া) প্রকৌশলী মর্তুজা খান, মীর্জা আবদুল সামাদ, মাইদুল ইসলাম (লেখক) দার্শনিক অধ্যাপক সাইদুর রহমান, ডা: এম, এ, ওয়াদুদ ন্যাপ নেতা হিসাবে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে এসেছেন। মুজিবনগর সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা বর্ষীয়ান রাজনীতিক অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ একমাত্র জীবন্ত কিংবদন্তী হয়ে আজও বেঁচে আছেন, যদিও দেশ ও দেশবাসী পতন-বন্ধুর পথে তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত ভূমিকা দেখেনি, পায়নি। '৭১ পরবর্তী রক্তাক্ত পরিবর্তন (বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা এবং কিছু দিন পরে কারারুদ্ধ চার জাতীয় নেতাকে কারাগারে নির্মমভাবে হত্যা করে খুনী মুশতাকের অনুগত মেজর বাহিনী। সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড ও জাতীয় ৪ নেতা হত্যাকারীদের ঘৃণ্য দায়মুক্তি দিয়ে আইন ও অর্ডিন্যান্স জারি করে খুনী মোশতাক এবং ক্ষমতার হাত বদলে সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্ত হন জিয়াউর রহমান। এসময়ে কি করা উচিত অধ্যাপক মুজাফফরের নির্দেশ চাইতে গেলে তিনি বলতেন "We have decided not to decide anything at the moment" দেখা গেল এই সিদ্ধান্তহীনতার সিদ্ধান্তটি দীর্ঘ পাঁচ বছরেও শেষ হয়নি। তৎপরবর্তীতে নব্বই উত্তর বয়সেও তিনি অসীম ধৈর্য্যশীলতার পরিচয় দিয়ে চলেছেন। জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাদখলের পর জিয়ার ১৯ দফা কর্মসূচির মধ্যে প্রগতিশীলতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ করে অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ ১৯ দফা হাজার হাজার কপি ছাপিয়ে বিলি করেন। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টিও জিয়াউর রহমানের হাঁ না ভোটে এবং জিয়ার খালকাটা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত পাকিস্তানি আমল, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশের পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন, স্বৈরাচার বিরোধী গণতন্ত্রের সংগ্রামে প্রতিটি পর্যায়ে ন্যাপ-কমিউনিষ্ট পার্টির বিপুল গৌরবময়

পৃষ্ঠা ২

মানব বন্ধনে রবীন্দ্র সরেনের প্রশ্ন

ভূমি কমিশন গঠনের দাবিতে বার বার স্মারকলিপি দিতে হবে?

॥ রতন সিং দিনাজপুর থেকে ॥

সমতল ভূমির দাবিতে আমরা আর কতদিন জেলা প্রশাসককে, প্রধান মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিব?

কতদিন আমাদেরকে রাজপথে নামতে হবে আর মানব বন্ধন করতে হবে? কেন আমাদেরকে বার বার স্মারক লিপি দিতে হবে? এই প্রশ্ন করেছেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্র সরেন।

১৮ জানুয়ারি দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সামনে সমতল আদিবাসীদের জন্য স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং ইটালিয়ান চিকিৎসক ও যাজক পিয়েরোকে হত্যা প্রচেষ্টার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে আয়োজিত এক মানব বন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই প্রশ্ন করেন। জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ও আদিবাসী ছাত্র পরিষদের যৌথ উদ্যেগে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

রবীন্দ্র সরেন বলেন, মুক্তিযুদ্ধে আমাদের আদিবাসী সমাজও অংশ নিয়েছে, যুদ্ধ করেছে, রক্ত দিয়েছে। তাহলে কেন আমাদেরকে আমাদের ভূমি নিয়ে হয়রানীর শিকার হতে হবে? কেন আমাদের ভূমি ভূমিদস্যুদের হাতে চলে যাবে?

রবীন্দ্র সরেন অবিলম্বে সমতলের আদিবাসীদের জন্য স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠনের দাবি জানিয়ে বলেন, সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা দূর করতে হলে অবশ্যই স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।

মানব বন্ধন কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দিনাজপুর জেলা কমিটি সভাপতি আলতাফ হোসাইন, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি রবিউল আউয়াল খোকা, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের জেলা সাধারণ সম্পাদক সুলতান কামাল উদ্দিন বাচ্চু, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের জেলা কমিটির সভাপতি সোহেল পিতর মুর্মু, সাধারণ সম্পাদক রুবেল টুডু, বীরগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি রানী হাসদা প্রমুখ। কর্মসূচি সঞ্চালন করেন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের দিনাজপুর জেলা কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক লাবু বেশরা।

গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে মনীন্দ্র কুমার নাথের মামলার বিবরণ

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

প্রদান করা হলো :

মাননীয়,
মুখ্য মহানগর হাকিম মহোদয়ের আদালত, ঢাকা
অভিযোগ

মনীন্দ্র কুমার নাথ, পিতা- শহীদ দীনেশ চন্দ্র নাথ, সাকিন ঃ পাঁচপাড়া, থানা- চন্দ্রগঞ্জ (সাবেক লক্ষ্মীপুর সদর), জেলা- লক্ষ্মীপুর; হালসাকিন- বাসা: ১৬/এ, রোড: ৯/এ, ফ্ল্যাট: ৫/সি ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, জেলা: ঢাকা-১২০৯

-বনাম-

গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, পিতা- মৃত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র রায়, সাকিন: মির্জাপুর, থানা- দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা-০৩; হালসাকিন: ২২৬/১ ঝর্নাকুঞ্জ, রায়ের বাজার, শেরে বাংলা রোড, ঢাকা-১২০৭; জেলা: ঢাকা। আসামী।

ঘটনার তারিখ ২৫.১২.২০১৫ শুক্রবার
ঘটনার সময় : সকাল আনুমানিক ১০ টা থেকে বিকাল আনুমানিক ৫টা পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে যে কোন সময়
ঘটনাস্থল জাতীয় প্রেস ক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা
দন্ডবিধি ৫০০ ধারা

নিবেদন এই,

১। অধীন অভিযোগকারী একজন সহজ, সরল, আইনমান্যকারী প্রকৃতির ব্যক্তি হই। ব্যাংকে চাকুরী করে অধীন কোনরকমে পরিবার পরিজন নিয়া দিন গুজরান করি। পক্ষান্তরে আসামী একজন শঠ, প্রতারক ও অসচ্চরিত্র প্রকৃতির লোক হয় বটে। ব্যক্তিস্বার্থে যা খুশি তা-ই করা, প্রয়োজনে নিরীহ লোকজনদের জনসমক্ষে অপমান করা তার নেশা ও পেশায় পরিণত হয়েছে। ধনে-জনে বলিয়ান বলে সে ধরাকে সরাজ্ঞান করে। আইন-কানুন কিছুই মানতে চায় না।

২। অধীন অভিযোগকারী একজন উচ্চশিক্ষিত সমাজসচেতন ব্যক্তি হই। ১৯৭৪ ইং সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর অধীন নানান কাজে নিয়োজিত থেকে অবশেষে ব্যাংকের চাকুরীতে নিয়োজিত হই। বর্তমানে অধীন অভিযোগকারী মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কর্মরত রয়েছি।

৩। ব্যাংকে চাকুরীর পাশাপাশি অধীন অভিযোগকারী নানান সমাজহিতকর কাজে এবং ধর্মীয় বৈষম্য বিরোধী মানবাধিকার আন্দোলনে যুক্ত রয়েছি। উক্ত রূপ সমাজকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৪ ইং সালে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি, ঢাকার সাধারণ সম্পাদক, ২০১২ ইং সালে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে জাতীয়ভাবে দায়িত্ব পালন করি। বর্তমানে অধীন অভিযোগকারী ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলনে রত বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছি।

৪। এতদ্ব্যতীত অধীন অভিযোগকারী নিজ গ্রামের এলাকায় উত্তরাধিকারসূত্রে নানান সমাজহিতৈষীমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছি। উক্ত কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে অধীন ১৯৭০ ইং সাল হতে ১৯৭৩ ইং সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পালপাড়া ডি.এম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসাবে কাজ করি। পাশাপাশি ১৯৭২ সাল হইতে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত পাঁচপাড়া বালিকা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে রত ছিলাম। অধীন একজন আয়কর উপদেষ্টা হিসাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তালিকাভুক্ত সদস্য। অধীন লক্ষ্মীপুর জেলা সমিতির একজন জীবনসদস্য। উক্তরূপে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে এবং সমাজহিতকর নানান কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকায় সমাজ ও পেশাগত পরিসরে অধীনের যথেষ্ট সুনাম, সুখ্যাতি বিদ্যমান ও বর্তমান।

৫। অধীন অভিযোগকারী একজন শহীদ পরিবারের সন্তান। অধীনের পিসেমশাই নরেন্দ্র কুমার নাথ ‘নরেন্দ্র উকিল’ নামেই সমধিক পরিচিতি ছিলেন। নোয়াখালীর মাইজদীর সদর আদালতে এল.এলবি ডিগ্রীধারী সিনিয়র আইনজীবী (সিভিল কমিশনার) হিসাবে আইনপেশায় নিয়োজিত থেকে স্থানীয়ভাবে বুদ্ধিজীবী হিসাবে সমাজে সমাদৃত ছিলেন। অধীনের পিতা দীনেশ চন্দ্র নাথ গ্রামের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। গত ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ও সংগঠক হিসাবে চিহ্নিত করে দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী রাজাকার ও আলবদর বাহিনী অধীনের পিতাকে ধরার উদ্দেশ্যে অধীনের গ্রামের বাড়িতে হানা দেয়। অধীনের পিতাকে না পেয়ে অধীনের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া অধীনের পিসেমশায়কে ধরে নিয়ে চন্দ্রগঞ্জ বাজারে যায়। পরবর্তীতে সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধীনের বড় ভগ্নিপতিকে ধরে নেয়ার খবর পেয়ে তাঁর সন্ধানের জন্য চন্দ্রগঞ্জ বাজারে গেলে রাজাকারেরা অধীনের পিতাকে সেখানে আটক করে মারধরে তাঁকে গুরুতর জখম করে। পরে অধীনের পিতা ও পিসেমশায় উভয়কে হত্যার উদ্দেশ্যে রাজাকারেরা স্থানীয় চন্দ্রগঞ্জের প্রতাপগঞ্জস্থ রাজাকার ক্যাম্পে ও পরবর্তীতে বেগমগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুলের সেনা ক্যাম্পে নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে তুলে দিলে পাক সেনারা তাদের নির্মমভাবে গুলিতে হত্যা করে লাশগুমের নিমিত্তে নিকটবর্তী কালোরপোলের নিচে খালে ফেলে দেয়। অধীন অভিযোগকারী ও অধীনের পরিবারের লোকজন এই দুইটি লাশের আর কোন হদিশ পাই নাই।

৬। গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ ইং তারিখ সকাল ১০টা হতে বিকাল ৫টার মধ্যে যে কোন সময় ঢাকার তোপখানা রোডস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ন্যাশনালিষ্ট এক্স স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ‘স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রুহুল কবীর রিজভী’ শিরোনামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত আলোচনা সভায় আসামী গয়েশ্বর চন্দ্র রায় আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিল। উক্ত আলোচনাসভায় আলোচক হিসাবে ভাষণ দানকালে সে বলে, “পাকিস্তানের যারা বেতন- ভাতা খাইছে, শেষদিন পর্যন্ত, তারা (শহীদ বুদ্ধিজীবী) নির্বোধের মত মারা গেল, আমাদের মত নির্বোধেরা প্রতিদিন তাদের শহীদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে ফুল দেয়। না গেলে আবার পাপ হয়। ওনারা যদি এত বুদ্ধিমান হন, তাহলে ১৪ তারিখ পর্যন্ত নিজের ঘরে থাকে কী করে, একটু বলুন তো। আর তা ছাড়া নিজ নিজ কর্মস্থলে প্রতিমাসে পাকিস্তানের বেতন খাইল, এটাও তো কথা বলা যায়, যায় না ? পাকিস্তান সরকারের তারা বেতন খাইল, তারা হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা, আর যারা পালায়ে পালায়ে না খেয়ে বেড়াল তারা হয়ে গেল রাজাকার। তাই না?’ এই আসামী আরো বলে, যাঁরা ২৫ মার্চে মারা গেছেন, তাঁরা মারা গেছেন না জানার কারণে। আর যাঁরা ১৪ ডিসেম্বর মারা গেছেন তারা অজ্ঞতার কারণে মারা যাননি। তাঁরা জ্ঞাতসারে অবস্থান করছিলেন।”

৭। আসামী গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের মুক্তিযুদ্ধের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে এহেন মন্তব্য ও বক্তব্য শহীদ পরিবারের একজন সন্তান হিসাবে অধীন অভিযোগকারীর শুধু মানহানি ঘটায় নাই, ব্যক্তিগতভাবেও অপমানিত করেছে। কেননা, স্থানীয় বুদ্ধিজীবী অধীনের পিসেমশাইর সাথে অধীনের পিতাও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ও সংগঠক হিসাবে নির্মমভাবে হত্যার শিকার হয়েছিলেন। শহীদ বুদ্ধিজীবীরা অধীন অভিযোগকারীসহ সকল আপামর বাঙালির আত্মার আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। আসামী গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের গত ২৫ শে ডিসেম্বর ২০১৫ ইং তারিখের বক্তব্য জাতীয় দৈনিক ‘প্রথম আলো’ পত্রিকার ২৭ ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় “গয়েশ্বরের বির্তকিত মন্তব্য” শিরোনামে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়। উক্ত তারিখের প্রথম পাতায় দৈনিক সমকাল পত্রিকায় “গয়েশ্বরের ধৃষ্টতা”, দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় “গয়েশ্বরের মতে শহীদ বুদ্ধিজীবীরা নির্বোধ” এবং দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার শেষ পাতায় “গয়েশ্বরের বক্তব্য পাকিস্তানকে খুশি করার অংশ” শিরোনামে প্রকাশিত হয়। অদ্যাবধি আসামী উক্ত সংবাদের কোনরূপ প্রতিবাদ বা অস্বীকার না করায় অধীন অভিযোগকারী নিশ্চিত হয়েছেন যে, আসামী জেনে শুনে শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের শহীদানদের পরিবারকে জনসমক্ষে হেয় করার বদমতলবে সে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ঐ ধৃষ্টতামূলক বক্তব্য ও মন্তব্য প্রদান করেছে।

৮। উক্তরূপে প্রকাশিত সংবাদপাঠে অধীনের পরিবারের লোকজন এমনকি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবের পুত্র-কন্যারাও অধীনের শহীদ পিতা ও পিসেমশাইকে নিয়ে নানান বিদ্রূপাত্মক ও কটু মন্তব্য করতে থাকে। আসামী গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য অধীনের মতই শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিদারুণভাবে জনসমক্ষে হেয় ও অপমান করায় অধীন অভিযোগকারী বাধ্য হয়ে হুজুরাদালতে অত্র অভিযোগ দায়ের করলাম।

৯। হুজুরাদালতের অবগতির নিমিত্তে অধীনের শিক্ষাগত, পেশাগত ও সামাজিক কর্মকান্ড সম্পর্কিত নানান নিদর্শনপত্রাদির ফটোকপি, অধীনের পিতা ও পিসেমশাইর হত্যা সম্পর্কিত বিষয়ে ১৯৯৪ সালের ১৪ ডিসেম্বরে প্রজন্ম একাত্তর, চিটাগাং বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বিজয় দিবস স্মরণিকা ‘আত্মজ’র সংশিষ্ট পাতার ফটোকপি, ২৭শে ডিসেম্বর প্রকাশিত দৈনিক প্রথম আলো, সমকাল, জনকণ্ঠ এবং যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত আসামীর বক্তব্য সম্বলিত সংবাদাদির ফটোকপি হুজুর আদালতের অবগতির নিমিত্তে এতদসঙ্গে সংযোজিত করলাম।

এমতাবস্থায়, প্রার্থনা যে, হুজুরআদালত কৃপাবিতরণপূর্বক উক্ত অভিযোগ গ্রহণে মামলা দন্ডবিধি ৫০০ ধারায় আমলে নিয়ে তলবানা জারিপূর্বক আইনের বিধানমতে আসামী গয়েশ্বর চন্দ্র রায়কে শাস্তিদানে বিহিত আজ্ঞা হোক।

ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা মতে অভিযোগকারীর বক্তব্য :

১। আমি এই মামলার অভিযোগকারী।

২। আমি অভিযোগ দায়ের করেছি গয়েশ্বর চন্দ্র রায়-এর বিরুদ্ধে।

৩। গত ২৫/১২/২০১৫ শুক্রবার সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৫টার মধ্যে যে কোন সময় তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের এক আলোচনা অনুষ্ঠানে ৭১ র মুক্তিযুদ্ধের শহীদান ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে মানহানিকর, রুচিহীন বিদ্রুপাত্মক বক্তব্য প্রদান করেছেন।

৪। ২৭শে ডিসেম্বরের প্রথম আলোসহ নানান জাতীয় দৈনিকে আসামীর মত গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত ও প্রচারিত হলেও গয়েশ্বর চন্দ্র রায় অদ্যাবধি তা অস্বীকার করে নাই। তদহেতু আমি নিশ্চিত হয়েছি পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্য আসামীরই বক্তব্য।

৫। আসামী গয়েশ্বর চন্দ্র রায় জেনে শুনে অধীন ও অধীনের মত শহীদ পরিবারের সন্তানদের ইচ্ছাকৃতভাবে অপমানিত করার বদমতলবে এহেন বক্তব্য প্রদান করেছে।

৬। আমি বিচার চাই।

৭। আমার সাক্ষী আছে।

তারিখ :....................

সাক্ষীগণ

১। শ্রীমতি অনিতা নাথ
২। শ্রীমতি মৌমিতা নাথ
৩। শ্রী বাসুদেব ধর
৪। শ্রী মিলন কান্তি দত্ত
৫। ক্যাপ্টেন শচীন কর্মকার

সংখ্যালঘুদের জমি দখলে সাংসদ ও মন্ত্রীর সংশিষ্টতার অভিযোগ

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

সুব্রত চৌধুরী। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত বছরের ২৪ ও ২৫ নভেম্বর অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেলভুক্ত সংগঠনের নাগরিক প্রতিনিধিরা পাড়িয়া ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলে সুলতানা কামাল, সুব্রত চৌধুরী, সারা হোসেনসহ জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, তিন দিকে ভারতীয় সীমান্ত-সংলগ্ন এলাকায় সাংসদ দবিরুল ইসলাম যে চা-বাগান গড়ে তুলেছেন, তার মধ্যে ১০টি হিন্দু পরিবারের ৩৫ একর চা-বাগান ও আবাদি জমি রয়েছে। এর মধ্যে অকুল চন্দ্র সিংয়ের এক বিঘা জমি অন্য জমিতে যাওয়ার পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন, সাংসদের ছেলে মাজহারুল সংখ্যালঘুদের জমি সাংসদের কাছে বিক্রির জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। ১৯ জুন সাংসদের ছেলে মাজহারুলের নেতৃত্বে ২৫-৩০ সন্ত্রাসী নিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর

পৃষ্ঠা ২

মামলা দায়েরের পর সময় টেলিভিশনের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ। ছবি : পরিষদ বার্তা

মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ॥ গয়েশ্বরের বিরুদ্ধে ঐক্য পরিষদ নেতা মণীন্দ্র কুমার নাথের মামলা

॥ আদালত বার্তা পরিবেশক ॥

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে বিতর্কিত বক্তব্যের অভিযোগে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ঢাকায় আবার মানহানি মামলা হয়েছে। বক্তব্যের ঘটনায় এর আগে নড়াইলে খালেদা জিয়া ও গয়েশ্বর রায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা হয়। গত ২১ জানুয়ারি ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুল হকের আদালতে মামলাটি দায়ের করেছেন শহীদ পরিবারের সন্তান, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মুক্তিযোদ্ধা মণীন্দ্র কুমার নাথ।

ঐদিন সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে এ মামলাটির শুনানি শেষে দেয়া আদেশে বিচারক আগামি ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শাহবাগ থানাকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার আর্জি মতে, গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় দলের এক আলোচনা সভায় শহীদ বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে গয়েশ্বর রায় বলেন, তারা নির্বোধের মতো মারা গেল, আমাদের মতো নির্বোধরা শহীদ বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাদের মাজারে ফুল দেয়। না গেলে আবার পাপ হয়। ওনারা যদি এত বুদ্ধিমান হন, তাহলে ১৪ তারিখ পর্যন্ত তারা নিজের ঘরে থাকে কি করে, একটু বলেন তো। তার এই বক্তব্য প্রকাশিত হলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়।

নিম্নে মামলার বাদীর বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ পৃষ্ঠা ৭

সংখ্যালঘুদের জমি দখলে সাংসদ ও মন্ত্রীর সংশিষ্টতার অভিযোগ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখলের বেশির ভাগ ঘটনায় প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা, সাংসদ এমনকি কোনো কোনো জেলায় মন্ত্রীর সংশিষ্টতার অভিযোগ এসেছে।

৮ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবে ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জমি দখল ও হামলার বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এ অভিযোগ করা হয়। কয়েকটি সংস্থা ও সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল' এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল, অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত চৌধুরী, ব্যস্টের অনারারি নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দেবনাথ, অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা ও সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সহসভাপতি তবারক হোসেইন। সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগী জিতেন্দ্র চন্দ্র সিং, ভাকারাম সিং ও অকুল চন্দ্র সিং উপস্থিত ছিলেন।

গত বছরের ২৯ জুলাই প্রথম আলোতে 'সংখ্যালঘুদের জমি দখলে নেমেছেন সাংসদ' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলা হয়, ঠাকুরগাঁও-২ আসনের সরকারদলীয় সাংসদ দবিরুল ইসলাম ও তাঁর ছেলে মাজহারুল ইসলাম ওরফে সুজন স্থানীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি দখল করে তাদের ওপর হামলা ও ভয়ভীতি দেখিয়ে যাচ্ছেন। ওই সাংসদ বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার পাড়িয়ায় রনবাগ ইসলামী টি এস্টেট কোম্পানি লিমিটেড নামে চা-বাগান গড়ে তুলেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পৃষ্ঠা ৭

আইনমন্ত্রীর সঙ্গে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাক্ষাৎ

সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বন্ধে সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের প্রস্তাব

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বন্ধে সরকারের পদক্ষেপ দাবি করে সংখ্যালঘু কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মতো সংখ্যালঘু-বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

গত ২৮ জানুয়ারি সচিবালয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সঙ্গে বৈঠক করে এ দাবি জানায় নির্মূল কমিটি। সংগঠনের পক্ষে সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী আইনমন্ত্রীর মাধ্যমে সরকারের কাছে ১২ দফা দাবি তুলে ধরেন।

লিখিত আবেদনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও নিপীড়নের অবসান ঘটাতে এবং ধর্ম-বর্ণসহ সব মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করতে আইন প্রণয়ন করার আহ্বান জানানো হয়। আইনমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর শাহরিয়ার কবির বলেন, 'আমরা সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সাক্ষী সুরক্ষা আইন প্রণয়নসহ বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেছি। মন্ত্রী আমাদের প্রস্তাবে নীতিগতভাবে সম্মতি জানিয়েছেন।'

এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, বিষয়টি নিয়ে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আনিসুল হক আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকার অপরাধ আইনের খসড়া তৈরি হচ্ছে। মানবতাবিরোধীদের সংগঠনের বিচারের বিধান রেখে ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন বিষয়টি ফেব্রুয়ারি মাসে মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদের সংখ্যা নিয়ে কটাক্ষ করে বিএনপির দেওয়া বক্তব্যের বিষয়ে আনিসুল হক বলেন, এ নিয়ে আইন প্রণয়নের কাজ চলছে। জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হবে কবে সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, 'আমরা শুধু জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার জন্য আইন করব না। আদালতের পর্যবেক্ষণের আলোকে আমরা কেবল মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে জড়িত দলগুলোর বিচারের ব্যবস্থা করব। বাকিটা আদালত বিবেচনা করবে।'

আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে নতুন বাধা সৃষ্টি করবে

নাগরিক সমন্বয় সেলের সংবাদ সম্মেলন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

আইন মন্ত্রণালয়ের একটি নির্দেশনা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে নতুন করে বাধা সৃষ্টি করতে পারে বলে অভিযোগ করেছে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন নাগরিক সমন্বয় সেল। গত ১৮ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সেলভুক্ত নয়টি মানবাধিকার ও নাগরিক সংগঠনের নেতারা এ অভিযোগ করেন। তবে আইনমন্ত্রী বলছেন, এটা নির্দেশনা নয়, অনুশাসনমাত্র।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গত বছরের ১১ নভেম্বর দেওয়া ওই নির্দেশনায় আইনমন্ত্রী বলেছেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণবিষয়ক ট্রাইব্যুনালের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন রিট করতে পারে। বিভিন্ন জেলায় যাঁরা সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার পক্ষে ট্রাইব্যুনালের রায় পেয়েছেন, আইন মন্ত্রণালয়ের ওই নির্দেশনা উলেখ করে তাঁদের সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার পরিবর্তে সরকার রিট করবে বলে বলা হচ্ছে। এর ফলে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ-প্রক্রিয়ায় নতুন করে একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এতে সম্পত্তি ফেরত পেতে দেরি হবে এবং ভুক্তভোগীদের হয়রানি আরও বাড়বে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এর আগে বেশ কিছু মামলায় সম্পত্তির দাবিদারদের পক্ষে রায় হওয়ার পর সংশিষ্ট জেলা প্রশাসকেরা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ না করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা চেয়েছিলেন। তখন ভূমি মন্ত্রণালয়ের দেওয়া নির্দেশনা নিয়েও ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। পরে গত বছরের ২৮ অক্টোবর ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্র জারি করার পর ওই ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। সেই পরিপত্রে বলা হয়, আইন অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত বিধায় রায় অনুসারে সম্পত্তি অবমুক্ত করতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন নেই। এরপর জেলা প্রশাসকেরা আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চান এবং তা নিয়ে নতুন করে টানাহেঁচড়া শুরু হয়েছে। যে কারণে এখন পর্যন্ত দেশের কোথাও একজন দাবিদারও সম্পত্তি ফেরত পাননি।

এ বিষয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক প্রথম আলোকে বলেন, এটি আইন মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দেশনা নয়। সলিসিটারের কার্যালয় থেকে পাঠানো একটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রীর দেওয়া অনুশাসনমাত্র। আইনমন্ত্রী বলেন, সলিসিটারের কার্যালয় থেকে তাঁর কাছে পাঠানো একটি ফাইলের নোটে বলা হয়েছিল, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো 'সিভিল রিভিশন' (জমিজমা-সংক্রান্ত মামলায় যার বিপক্ষে রায় হয়, তাঁর করা আপিল-বিশেষ) করা হবে কি না। এর জবাবে তিনি অনুশাসন দিয়েছেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে ট্রাইব্যুনালের রায়ই চূড়ান্ত। তাই এ ক্ষেত্রে সিভিল রিভিশন করার কোনো সুযোগ নেই। তবে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে রিট (সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার প্রতিকার চেয়ে উচ্চ আদালতে করা আবেদন) করতে পারেন।

সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকা 'ক' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের রায় সম্পত্তির দাবিদার ব্যক্তির পক্ষে গেলে সরকারই সংক্ষুব্ধ হয়ে রিট করতে পারে কি না এবং প্রতিটি রায়ের ক্ষেত্রে আলাদা রিট হবে কি না, জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসকেরা প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে আলাদা রিট করতে পারেন। তবে প্রত্যর্পণ আইন এবং সরকারের এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা পৃষ্ঠা ২

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ২৬, বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক, নাহার পাজ্জা, ১০ম তলা, (কক্ষ নং, ১০০৮ বি) ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২